অস্বস্তিকর

মামুন জাহাঙ্গীর

১)রানার ভর্তি সমস্যা :- ঐতিহ্যের ও লেখাপড়ার সাফল্যের বিবেচনায় চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম কলেজ অদ্বিতীয়। তাই প্রতি বছর এখানে ভর্তি হবার জন্য সব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচন্ড ভীড় হয়। এ কারনে ভর্তি পরীক্ষা ও তার পরে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাচাই করে প্রকৃত মেধাবীদের নির্বচিত করা হয়। এ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আলাদা ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়।১৯৮৩ সালে আমি ভর্তি কমিটি সদস্য হই। কমিটির আহবায়ক ছিলেন রসায়ন বিভাগের প্রধান জনাব সিরাজুল ইসলাম। তিনি যেমন ছিলেন ধর্মভীরু তেমনি ন্যায় পরায়ন। নীতির পক্ষে তিনি কারো কাছে মাথা নত করতে নারাজ। সে বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে শীর্ষস্থান অধিকারীও ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল। চট্টগ্রাম কলেজের একটা ঐতিহ্য ছিল– ভর্তি যোগ্যতা কেবলমাত্র ভর্তির পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল, বোর্ডের ফলাফলের উপর নয়। কিন্তু ঘটনা ক্রমে ভর্তি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিতদের সর্বনিম্ন নম্বর স্থির হল ৩৩। কিন্তু উক্ত পরীক্ষার্থী দুর্ভাগ্যক্রমে পেয়েছে ২৮। উক্ত পরীক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসতে লাগল। কিন্তু সিরাজ সাহেবের দৃঢ় মনোবলের কাছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালঢেয়র তৎকালীন ভাইস-চ্যাঞ্চেলারের তদ্বিরও নাকি নিস্ফল হয়েছিল।

চট্টগ্রামে এসে একদম নিসঙ্গ হয়ে পড়ি। সময় কাটাবার জন্য মাঝেমাঝে চাচাত বোন তাহেরা খানম (বুলবুল) আপার বাসায় যাই । কিন্তু তা হয়ত দু'তিন মাস পরপর ।তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন,চাচাত ভাই হিসাবে যতটুকু স্নেহ পবার, মনে হল যেন তার চেয়েও বেশী। তাঁর বাসায় গেলে দীর্ঘক্ষন ধরে বাড়ীর সব খোঁজ খবর, এটা -সেটা নানান গল্পে কাটাতেন। অনেকদিন এমনও হয়েছে যে, বেশী রাত্র হয়ে গেলে রাতের খাবার খাওয়ায়ে মেহবানদের থাকাল ঘরে ঘুমাতে দিতেন। আমার বিয়ের পর সেটা আরো বেড়ে যায়, আমার স্ত্রী ও মেয়েরা অন্তর্ভুক্ত হয়। আমার বাসায় আসতে তিনি কোনদিন খালী হাতে আসেন নি। আমার দুই মেয়ে হবার জন্য আমার বড় শ্যালকের স্ত্রী ডাঃ মমতাজ বেগম হাসপাতালে নিজে থেকে ডাক্তারদের সাহায্য করেও দুএকদিন বাসায় নিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখত। সে সময়ে আপা আমার স্ত্রীর জন্য নিজ হাতে রান্না করে খাবার নিয়ে আসতেন।

আমি একবার অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রামে মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে ভর্তি হলে ৪ ব্যাগ রক্ত দিতে হয়েছে।দুই ব্যাগ আপা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এং দুই ব্যাগ দিয়েছেন সহকর্মী নাঈম সাব।

আপাার বড় ছেলে রানা ভর্তি লিখিত পরীক্ষায় অতি উত্তম ফলাফল দেখিয়েছে। ছাত্র হিসাবেও ভাল, ইংরেজী মেডিয়ামের স্কুলে লেখাপড়া করেছে। মৌখিক পরীক্ষায় সে সব প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক দিয়েছে। কিন্তু তাকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হল না। আমার আত্নীয় বলে তাকে ভর্তির জন্য অনুরোধ জানালে তাঁর উত্তর ছিল, মুসলমান হয়ে যে মুসলমান গুরুজনকে গুড মনিং বলে অভিবাদন করে তাকে তার অভিভাবক কর্তৃক ‘ ছেলেটি কলেজে থাকাকালীন সময়ে ভাল আচনর করবে’ এরূপ আশ্বাস দেয়া ছাড়া ভর্তি করা যায় না। ফলে আমি আপাকে বললে তার বাবা এসে সেমতে আশ্বাস দিলে তাকে ভর্তি করিয়েছিল। ভর্তি কমিটির সদস্য হওয়াতে ভর্তি ইচছুক শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছে ভর্তি কমিটির সদস্যদের কদর বহুগুনে বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে আমরা অনিয়ম করে ভর্তি করানোর চেষ্টাও করিনি। তখনকার নিয়মানুসারে খোদ অধ্যক্ষের সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ভর্তি হতে হত। প্রত্যেক বিভাগেই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধার বিধান থাকলেও শিক্ষা বিভাগে তার ব্যতিক্রম। তাই শিক্ষকদেরকে নামমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন ব্যাতিত সামাজিক কোন গুরুত্বই দেয়া হয়না।

২)শিরিনের চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি :-

একদিন বাইরে থেকে ফিরে আসলে সহকর্মী একজন বলল,“ আপনি এতক্ষ কোথায় ছিলেন ? আপনার খালু তাঁর মেয়েকে ভর্তি করাবার জন্য আপনাকে খোঁজ করে গেছেন। সম্ভব হলে আপনাকে আপনার খালার সাথে দেখা করতে বলে গেছেন” । তাঁর প্রদত্ত ঠিকানার সূত্র ধরে একদিন গিয়ে হাজি হলাম তাদের বাসায়। আমাকে পেয়ে তাঁরা আনন্দে আটখানা। খালাম্মকে কোন দিনও দেখিনি। আলাচনায় জানতে পারলাম তিনি ছোট নানীর ভাই-এর মেয়ে। তাঁর ছোট ছোট তিন মেয়ে ও চার ছেলে। কেউ স্কুলের গন্ডি পেরুইনি, তবে সবাই মেধাবী। সেখানেই দেখা হল একটি মেয়ের সাথে যে আমাদের কলেজে ভর্তি হতে চায় এবং তার বড় বোনের সাথে। উভয়েই খালুর আগের সংসারের মেয়ে। আগের সংসারের পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে। বড় তিন মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে এবং খালুর আগের স্ত্রী দু’টি শিশু পুত্র সন্তানকে নিয়ে বড় মেয়ের বাসায় থাকে। সম্ভবত: আমার খালাম্মা তাঁর স্নেহাদর দিয়ে তাঁর সতিনের দু’টি অবিবাহিত মেয়েকে ধরে রাখতে পেরেছেন। বড় মেয়েটি উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সে সংসারের কাজকর্মে খালাম্মাকে দারুনভাবে সাহায্য করে।

ছোট মেয়েটি আমাদের কলেজে ভর্তি হওয়াতে আমাকে এড়িয়ে চলে। আলাপ- আলোচনার জন্য পেলাম খালাম্মাকে এবং গল্প করার জন্য বড় মেয়েটাকে। প্রথম প্রথম তার সাথে আলাপে আড়ষ্টতা ছিল। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তারই ঘনিষ্ঠা বান্ধবীর মেজ ভাই-এর সাথে তখন নিশ্চিন্তে সে বাসায় যাওয়া-আসা করে অবসর সময় কাটাতে লাগলাম। মার সাথে হয়ত কোন দিনও এই খালার দেখা হয়নি তবুও একান্তই সম্পর্কের কারনে খালাম্মার কি যেন এক মায়াবী টানে প্রায় প্রতিদিনই সেখানে যেতাম,মনে হত মায়ের কিছুটা হলেও গন্ধ কিংবা স্পর্শ পেতাম।

খালাম্মার মেজ মেয়ে শিরিন এস এস সি তে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে।চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: ভর্তি পরীক্ষার দিন তার ভীষন জ্বর।চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তির কড়াকড়ির কারনে ভর্তি পরীক্ষা না দেবার বিকল্প নেই।তাদের বাসা সংলগ্ন কলেজকে বাদ দিয়ে অনেক দূরে গার্লস কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করার কথা ভাবাই যায়না। তাই প্রচন্ড জ্বর নিয়েই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে হয়। এস এস সি তে মেধার পরিচয় দিলেও ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল নির্বাচিতদের তালিকায় তার নাম নেই। খালাম্মা এতে খুবই ভেঙ্গে পড়লেন।আমাকে ডেকে নিয়ে এ ব্যাপারে আমার সাথে শেয়ার করলেন।চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষকদের যেখানে কিছু করার ছিল না সেখানে অন্য অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের একজন শিক্ষক হয়ে আমি কি করব , ভেবে পেলাম না।সেই মুহূর্তে চট্টগ্রাম কলেজের গনিতের সহকারী অধ্যাপক আবদুস সাত্তার সাবের কথা মনে পড়ল। তিনি একই বিভাগের লোকই নন মানিকগঞ্জের লোক বলে আমার সাথে বিশেষ আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল। তাঁর সাথে দেখা করে ব্যাপারটা তাঁকে অবহিত করলে তিনি এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি বহুদিন যাবৎ সরওয়ার্দী হোষ্টেলের সুপার থাকার কারনে কলেজে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তিনি সরাসরি ভর্তি কমিটির কক্ষে ডুকে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পেলেন যে, শিরিন পরীক্ষার খাতায় পেয়েছে ৪২ কিন্তু ফলাফল তালিকায় ভুলক্রমে লিখা হয়েছে ২৪ এতে পরীক্ষা কমিটি লজ্জিত হলেও খালাম্মাদের সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। পরদিনই তার ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরবর্তীতে সে এইচ এস সিতে এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পাশ করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র হতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করে এসে চট্টগ্রামে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: শাহানারা চৌধুরী হিসাবে সবার কাছে সমাদৃত।

৩)আইন কলেজ আমার কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করতেন এবং তার প্রভাব শিক্ষকতা জীবনেও পরেছে। কিন্তু প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বহু বাধার সৃষ্টি করে। তিনি অত্যান্ত চতুর ছিলেন,এরূপ কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা

করতেন। কলেজের উন্নয়নমূলক কাজে তাঁকে প্রায়ই শিক্ষাভবনে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেতে হত। আপদকালীন সময়ে তিনি নানান কাজের ছুতুতে বোর্ড অফিসে কিংবা অন্যত্র চলে যেতেন । তেমন কোন সুযোগ না থাকলে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে ঘরের মধ্যে চুপটি করে পড়ে থাকতেন। সব ঝামেলা সইতে হত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে। একবার আইন কলেজের পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে নোয়াখালী কলেজ কর্তৃপক্ষকে। যথারীতি আয়োজন করা হল। আইন কলেজের অধ্যক্ষকে তাদের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ফি প্রদান পূর্বক প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করে পত্র পাঠানো হল॥ কিন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। তারা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর তদ্বির চালালো এবং এমনও জানিয়ে এলো যে কেন্দ্র পরিবর্তন না হলে কেউ পরীক্ষা দেবে না। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, নোয়াখালীতে আইন কলেজের পরীক্ষায় বিপুলভাবে নকল হল ।তার অন্যতম কারন হলো প্রশাসনের কর্মকর্তারাও এই পরীক্ষা অংশ গ্রহন করে থাকেন ।ফলে সেই কলেজের শিক্ষকদের সাহস হয়না তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করা। অপর পক্ষে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারনে তাদেরকে ক্লাশে উপস্থিত থেকে আইন সম্মন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না হলেও প্রভাব খাটিয়ে উপস্থিতি দেখানো সম্ভব হতো ।কিন্তু পরীক্ষার উত্তর পত্রে কিছু লিখার জন্য অসদোপায় অবলম্বন করতেই হতো। এ প্রবনতাকে রোধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই নোয়াখালী সরকারি কলেজ কেন্দ্র পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত নেন। আকাশে যখন মেঘের ঘনঘটা,ঝড়ের পুর্বাবাস তখনই অধ্যক্ষ মহোদয় অসুস্থ হয়ে ছুটি নিয়ে নিলেন ।এই যখন পরিস্থিতি তখন জেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভিসি মহোদয় নোয়াখালী সার্কিট হাউজে এসে উপস্থিত হলেন্ ।তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে সাবসিডারীতে আমার একই ক্লাসে ছাত্র। যদিও তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। সেরা ছাত্র হিসাবে আমি তাঁকে দূর থেকে দেখে চিনি কিন্তু আমি অখ্যাত বলে হয়ত তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারিনি। এইটুকু সম্পর্কের উপর আশ্রয় করে ব্যাপারটার আগে বাগে সমাধানের আশায় সার্কিট হাউজে গেলাম। কিন্তু তাঁকে তাঁর কক্ষে পেলাম না। হয়ত প্রশাসনের সাথে আলোচনায় অন্যত্র অবস্থান করছিলেন।

পরীক্ষার দিন পর্যন্ত কেউ প্রবেশপত্র নিতে এলোনা ।পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে প্রো ভিসি মহোদয় আইন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে নিয়ে আমাদের কলেজে হাজির। উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনা ও পরিশেষে বাক-বিতন্ডার হল। আইন করেজের অধ্যক্ষ মহোদয় জানালেন যে পরীক্ষার্থীরা কোন ক্রমেই নোয়াখালী সরকারি কলেজে এসে পরীক্ষা দিতে রাজী নয়। ভাব খানা যেন পরীক্ষার্থীরা ঠিক করবে তারা কোথায় পরীক্ষা দেবে,কোথায় তাদের নকলের অবাধ সুযোগ

থাকবে ।কি আর করা , প্রো ভিসি মহোদয় হয়ত ভাবলেন যে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে পরীক্ষা নিতে পারলেন না। তাই তিনি হয়ত নিজের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য ডিসি সাহেবের সাথে আলাপ করে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কেন্দ্র পরিবর্তন করে পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করলেন। এভাবেই আমরা পরিস্থিতির কারনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হই ।কিন্তু আমার তরুন শিক্ষকরা তো কারো দয়ায় চাকরী পান নি, নিজের যোগ্যতা দ্বারা এখানে এসেছেন। তাঁরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে গিয়েও ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, খোদ জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটকে নকলের দায়ে বহিস্কার করে।

৪)কুমিল্লা ভ্রমন : মা এসেছেন নোয়াখালীতে আমাদের বাসায়। ছুটির দিনও কাজ । মাকে ও পরিবারের সকলকে নিয়ে কোথায়ও ঘুরতে যাবার জো নেই। তাই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। বড় মেয়ে নিমুনের পরীক্ষার ফল বের হয়েছে মাত্র। ভর্তি হবার পূর্বে কিছুদিন অবসরে আছে। নোয়াখালী বালিকা বিদ্যালয়ের তার এক প্রিয় বান্ধবী কুমিল্লা চলে গেলেও যোগাযোগ অক্ষুন্ন আছে। তার ইচ্ছা দুজনের সাক্ষাৎ হোক। এ সময়ে কলেজের পরীক্ষাও শেষ, কুমিল্লা বোর্ড হতে গনিতের অন্যতম প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছি। সেখানে কমপক্ষে দুদিন থাকতে হবে। থাকার জন্য বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে । তবে শহরের অন্যত্র থেকেও প্রধান পরিক্ষকের দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হয় না। শোনেছি ছোট খালু বগুড়া কলেজ থেকে অবসর গ্রহন করে শ্রীকাইল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তখন কুমিল্লাতে বাড়ী কিনে সপরিবারে বসবাস করছেন ।মুহুর্তের মধ্যে মনে হল মাকে ও নিমুনকে নিয়ে কুমিল্লা থেকে ঘুরে আসলে কেমন হয়। এক ঢিলে তিন পাখী, মাকে খুশি করা ও নিমুন ও তার বান্ধবী সাক্ষাৎ এবং প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন। বাসায় এসে মাকে বললে মা আপত্তি জানায়ে বললেন, তুমি যাচ্ছ কাজে, সেখানে আমাকে নিয়ে ঝামেলা করার দরকার নেই। প্রতিরোত্তরে বললাম, আমাকে তো যেতেই হবে, সেখানে আপনাকে নিলে কি আর ঝামেলা। জোড়াজোড়ি করাতে মা রাজি হয়ে গেলেন এবং যাবার আগে মার মনে উৎফুল্লতা লক্ষ্য করলাম ।আর তা হবে না কেন, কতদিন ছোট বোনটাকে দেখেন না। যাবার পর মাকে দেখে খালা তো বটেই, খালুর আনন্দ দেখে কে ? বুঝতে পারলাম মা খালুকে ছোট ভাইয়ের মত কত স্নেহ করতেন এবং খালুও মাকে কত সম্মান করতেন। অতীতের অনেক স্মৃতি রোমন্থল হল যেন বাল্যকালের গলা ধরাধরি জীবন ফিরে পেয়েছেন। খালা এত বয়সেও নিজ হাতে নানান রকমের তরকারী রেধে আমাদেরকে খাওয়ালেন।

সেদিন খালার তুতীয় মেয়ে রোজী ঢাকা থেকে এসেছে । তাকে আমি খালার সাথে আগেও দেখেছি। খালা বগুড়া থাকাতে আমাদের খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ নেই। সেটাই হয়ত প্রথম দেখা। হঠাৎ করে সে আমাকে মামুন ভাই বলে সম্বোধন করাতে মুরব্বী হবার সুখ অনুভব করলেও ভেবে পেলাম না, কিভাবে বড়/ ছোটর সিদ্ধান্ত এল। আমি তার জন্ম তারিখ জানিনা, সেও হয়ত জানেনা।

তবে মেয়েরা নাকি তাদের বয়স কমাতে চায়। এরূপ একটি গল্প শোনেছি। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই ছাত্রী, নিচের ক্লাশের জন ওপরের ক্লাশের জনকে আপা বলে সম্বোধন করে আসছে, কিন্তু যখন জানতে পারল তারা পরস্পরে খালা- ভাগ্নি তখনই বিপত্তি ঘটল। খালা কিছুতেই রক্তের সম্পর্ক বহাল রাখতে নারাজ ,পাছে লোকে তাকে খালা/ নানীর বয়স্কা ভাবে।তবে রোজি নিজ থেকে বলছে বলে বলছিনা,হয়ত খালাম্মার কাছ থেকে জেনেই বলেছে।

এরপর দ্বিতীয়বার আমার স্ত্রীকে নিয়ে চট্টগ্রামে বন বিভাগে রোজীদের বাসায় যাই। তার স্বামী তখন বন বিভাগের কর্মকর্তা ছিল। সেখানে ফেরদাউসী আপার সাথেও দেখা হয়। তাই কুমিল্লায় তৃতীয় বারের মত দেখা।মাকে পেয়ে সেও খুশি।সে রাতে অতি আরামে সুখ নিদ্রা হল। সকালে উঠে নাস্তা করে বোর্ড অফিসে চলে গেলাম। সেখান থেকে কাজ সেরে বাসায় এসে মার কাছে শোনলাম গতকাল রোজীর কিছু টাকা হারানো গেছে। সন্দেহ গিয়ে পড়ল কাজের মেয়ের উপর । কিন্তু সে দীর্ঘ দিন যাবৎ এ বাসায় কাজ করে যাচ্ছে্,আজ পর্যন্ত কিছু খোয়া যায়নি বলে বড়ই বিশ্বস্ত।এ সব শোনে বাসার সকলে মহা চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হল না্, বিকালে সে কাজে আসলে রোজী তাতে চেপে ধরলেও কিছুতেই স্বীকার করল না। তখন তাকে মারধরের এমনকি পুলিশের ভয় দেখানোতে ভরকে গেল এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠে স্বীকার করল। সবার মনে স্বস্তি ফিরে এলো। সে হয়ত ভেবেছিল, আমি তো দীর্ঘদিন এখানে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যাচ্ছি।তাই আমাকে অবিশ্বাস না করে নতুন আগুন্তুকদের সন্দেহ করবে।কিন্তু তারা আপন লোক বলে কিছু বলতে পারবেনা,চেপে যাবে, আর আমি সন্দেহের উর্ধে থেকে যাব।
